বঙ্গে মহামারী

অরুণাভ সেনগুপ্ত

মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি – কবির উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে বাঙালী জাতির জয়গান কিন্তু কালক্রমে 'মন্বন্তর' আর 'মারী' শব্দ দুটি সমীকৃত হয়ে বাঙালি চেতনায় বিস্তারিত হয়েছে ব্যাধি জর্জর এক অনির্দিষ্ট অতীতের ধারণায় যার গোড়াপত্তন সম্ভবত ইংরেজ কোম্পানির সাহেবদের এদেশে এসে প্রায়শ অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যুর নানা বিবরণী থেকে। ক্রান্তীয় আফ্রিকায় প্রবেশে অজানা সব রোগের প্রতিবন্ধকতার অভিজ্ঞতা আর মৃত উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ দেহাবশেষ থেকে উদ্ভূত দুষিত পদার্থ 'মিয়াস্মার' বায়ুমণ্ডলে বাড়তি উপস্থিতিই সংক্রামক রোগের উৎপাদক এবংবিধ তৎকালীন ধারনার সাথে মিলিয়ে এ দেশীয় জলে জংগলে ভরা আবহকেই স্বাস্থ্যহানির জন্য দায়ী করেন সাহেবরা। সমকালীন ইংরেজ চিকিৎসকরা যদিও অংশত দায়ী করেছেন নবাগত সাহেবদের স্থানীয় আবহাওয়ার অনুপযোগী চালচলন, অপরিমিত পান ভজন, আর বেনিয়মি জীবন যাত্রাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ বঙ্গে মারী নিয়ে ঘর করার ইতিহাস কবে থেকে ও কি কারণে? পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক সমাজে জন ঘনত্ব বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রবজ্যা, আর দুর্ভিক্ষের কারণে রোগ সংক্রমণ বিশ্ব জুড়েই, ভারত তথা বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখিত "আগন্তুজ" ব্যাধি আর 'জনপদ ধ্বংসকারী' ব্যাধি তার প্রমাণ। তথাপি, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিদেশী বনিকদের আনাগোনায় ব্যস্ত জনবহুল নগরী-শ্রেষ্ঠ গৌরের প্লেগে শ্মশান হয়ে যাওয়া আর ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের সময় বসন্ত রোগের মহামারী হওয়া ছাড়া কোম্পানি আমলের আগে বাংলাদেশে মহামারীর ইতিহাস নেই। মুঘল, আফগান, মারাঠা কেউই এ অঞ্চলকে রোগের ভয়ে এড়িয়ে চলতেন না। দেশগত সংক্রমণের অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাসেও নেই, লৌকিক কথা বা প্রথাতেও নেই। তিনটি প্রধান সংক্রামক রোগ বসন্ত , কলেরা, ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে বসন্ত বিশ্বজোড়া প্রাচীন রোগ। ফলে পুরাণে লোক কথায় এসেছেন বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা। খালি বসন্ত নয় শীতলা নানা ধরনের জ্বরেরও উপশম কারী দেবী, পুরাণে উল্লিখিত দেবী কাত্যায়নী যিনি দক্ষ যজ্ঞের সময় তাণ্ডবরত শিবের স্বেদে জন্মান জ্বরাসুরকে বশীভূত করেন। তুলনায় কলেরা বা ম্যালেরিয়া এদেশে অর্বাচীন, তাই লোককথায় এদের স্থান নেই। কলেরা অতিমারীর অনেক আগেই উদরাময়

নিরাময়ে ওলাই চণ্ডী বা ওলাবিবির তুষ্টিকরন কিছু জায়গায় স্থানীয় ভাবে চালু হলেও তার বিশেষ মান্যতা নেই। কবিরাজরা বিসূচিকা ও বিভিন্ন আন্ত্রিক পীড়া বা সবিরাম অবিরাম নানা ধরনের জ্বরের লক্ষণ মিলিয়ে চিকিৎসা করতেন। প্রথম দিককার ইংরাজ চিকিৎসকরাও তাই। কিন্তু রোগীদের যে বিস্তারিত বর্ণনা তাঁরা লিখে গেছেন তার থেকে কোন একটি বিশেষ অসুখের লাগাতার সংক্রমণের ছবিটা স্পষ্ট নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দেশীয় পত্র পত্রিকাতেও নয়। স্মর্তব্য, তৎকালীন আলোচনায় ‘কলেরাটিক ডিজিসেস’ বা ‘ম্যালেরিয়াস ফিভার’ সমলক্ষণ যুক্ত বিভিন্ন অসুখকে বোঝাত, শুধুমাত্র মহামারী কারক হিসাবে পরবর্তীকালে স্বীকৃত অবিমিশ্র ‘কলেরা’ বা ‘ম্যালেরিয়া’কে নয়।

পরবর্তী গবেষণায় এখন প্রতিষ্ঠিত কিভাবে বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলে সামুদ্রিক নোনা জলে জন্মান ভিব্রিও কলেরা ব্যাসিলাস থেকে এশিয়াটিক কলেরার উৎপত্তি। ১৭৭১ সাল থেকে ইংরাজরা সুন্দরবন এলাকায় জমি বন্টন করে বন কেটে বসত বসানোর কাজ আরম্ভ করায় জোয়ারে ঢুকে আসা নোনা জল গৃহস্থলীর নানা কাজে ব্যবহৃত জলের সঙ্গে মিশে যেতে কলেরার জীবাণুদের সুযোগ হয়ে গেল মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করার আর সেখানে সংক্রমণ ঘটানর ক্ষমতা আওত্তা করার। উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ পেতেই ১৮১৭ সালে গাঙ্গেয় ব দ্বীপে উৎপন্ন সেই সংক্রমণ থেকে ঘটল পৃথিবী জুড়ে এশিয়াটিক কলেরার প্রথম অতিমারী এবং তারই পুনরাবৃত্তি চলল দেড়শ বছর ধরে আরও সাতটি অতিমারীতে। ম্যালেরিয়া ধরনের মারাত্মক জ্বরের ব্যাপ্তি ১৮৫০ এর পর। দক্ষিণ বঙ্গের জেলা গুলি নিয়ে গঠিত তদানীন্তন বর্ধমান ডিভিশনে প্রকোপ বেশী হওয়াতে প্রশাসন নাম দিলেন বারডওয়ান ফিভার, লোক মুখে নতুন জর, পালা জ্বর, জঙ্গুলে জ্বর ইত্যাদি। কিছু চিকিৎসকের মতে এ হল অসমীয়া কালাজ্বর । এ দেশে সিঙ্কোনা চাষ শুরুর আগেই ১৮২০ র পর থেকেই নানা ধরনের জ্বরের চিকিৎসায় আমদানি করা কুইনাইনিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেখা গেল এই বিশেষ জ্বরে কুইনাইন বিশেষ ফলপ্রসূ। জ্বরের প্রকৃতি নির্ধারণেও কাজে লেগে গেল কুইনাইন। সরকারী নির্দেশে খালি চিকিৎসার জন্য নয় অগ্রিম প্রতিষেধক হিসাবেও নিয়মিত কুইনাইনের ব্যাবহার শুরু হোল বিশেষ করে সৈন্য দলের মধ্যে । গোরাসেনাদের তেতো ওষুধ খাওয়ানর জন্য তৈরি হল পানীয় ‘জিন এন্ড

টনিক', টনিকের অন্যতম অনুপান কুইনাইন। ক্রমশ মহামারীর আকার নেওয়া এ জ্বরের উৎস সন্ধানে ১৮৬৪ তে গড়া হল 'এপিডেমিক কমিশন'। কমিশনের সদস্য রাজা দিগম্বর মিটার এ নিয়ে বিস্তারিত লিখলেন হিন্দু প্যাট্রিয়টে। তিনি এবং আরও অনেকেই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করলেন পর্যাপ্ত পয়োনালি ছাড়া রেল লাইন পাতা, পাকা সড়ক তৈরি, এবং যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণকে যার একটা বিষম ফল হল স্বাভাবিক জল নিকাশির পথ বন্ধ হয়ে বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জমি অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ জলায় পরিণত হওয়া। যার সঙ্গে যুক্ত হল ইংরেজদের খাজনা মেটাতে পঙ্গু ভূস্বামীদের নিজভূমির প্রতি অযত্ন, জলাশয় সংস্করণে অবহেলা। এ সময়েই জীবাণু তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৪ তে কলকাতাতে রবার্ট কখের জলে থাকা কলেরার জীবাণু 'কমা ব্যাসিলাস' বা ভিব্রিও কলেরার আবিষ্কার, আর ১৮৯৭ তে রোনাল্ড রসের বদ্ধ জলা জমিতে বংশবৃদ্ধি করা মশাবাহিত এককোষী পরজীবী প্লাসমোডিয়ার সাথে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা। দূষিত পরিবেশ-জীবাণু-সংক্রামক রোগ সম্পর্ক জানার পর নিকাশি সাফাই ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার সচেষ্ট হলেও পরাধীন দেশে কাজ সামান্যই হল। প্রসঙ্গত, ১৮৯৮ তেই রসের পাখির ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরুর একটা কারণ কলকাতায় তখনও যথেষ্ট নতুন ম্যালেরিয়া রোগীর অভাব!

এ বঙ্গে মারী নিয়ে ঘর করার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ গবেষকের বিষয় কিন্তু এটা নিশ্চিত গ্রামে গ্রামে মড়কের গল্পটার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগ আর বসতি বিস্তারের ফলে পাল্টান পরিবেশে যাতে ক্রমশ যুক্ত হল অন্য নানা কারণের সাথে সুন্দরবন থেকে তরাই অবধি বিপুল সংখ্যক বহিরাগতদের ঘিঞ্জি বস্তি স্থাপন, কোনরূপ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছাড়াই। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে একটা বাড়তি কারণ অবশ্যই মানব শরীরে এর বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে বা কার্যকারী টীকা আবিষ্কারে অসাফল্য।